"হৃদয় আছে যার সেই তো ভালবাসে "

এন্ট্রান্স পাশ করার পর আমি যখন স্কটিশে এসে ভর্তি হলাম , তখন আমার কাছে সেটা একটা খুব thrilling ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল। গার্জেনদের সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে এতদিন পর্যন্ত যে সব সুন্দরী মেয়েদেরকে এ জানলা থেকে ও জানলায় লুকিয়ে চুরিয়ে একটু দেখার জন্য মনটা সব সময় কেমন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতো। স্নান সেরে এলোচুলে ছাতে শাড়ি মেলতে আসা যে মেয়েটিকে দূর থেকে এক পলকের দেখার জন্য দিনের পর দিন নির্দিষ্ট সময়ে অকারণ দাঁড়িয়ে থেকেছি ছাতে , কিংবা ক্বচিৎ কখনো যাদের সাথে হঠাৎ পথে দেখা হয়ে গেলে হৃদয়ের ভেতরটায় কেমন যেন একটা মোচড় দিয়ে উঠত , সেই সব কল্পনার রঙে রাঙা মেয়েদের সাথে যখন একই ক্লাশে প্রায় একই বেঞ্চিতে বসে ক্লাশ করতে এলাম , যখন আর শুধু এ জানালা থেকে ও জানালায় ক্ষণিকের দেখা হওয়াই নয় , একেবারে সেই মেয়ের শরীরের মিষ্টি গন্ধটা পর্যন্ত প্রতিদিন স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলাম , পাশাপাশি পথ চলতে গিয়ে এলোমেলো হাওয়ায় যখন প্রায়ই ছুঁয়ে যেতে লাগলো তার শরীর জড়ানো শাড়ীর আঁচলপ্রান্ত , যখন খাতাপত্র দেয়ানেয়ার ফাঁকে অসাবধানে হাতে হাত ছুঁয়ে গেলে পর ওকে লাজে রক্তিম হয়ে উঠতে দেখতাম , তখন সব কিছু মিলে নিজের ভেতরটাতেও কেমন যেন একটা হাপরটানা মতো অনুভূতি হত। যে অনুভূতি যতটা না গদ্য , তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল বোধ হয় কবিতা। তাই কবি না হয়েও সেদিনের সেই অনুভূতি নিয়ে কবির মতো করে এটুকুই হয়তো শুধু বলতে পারি :-

ওর কথা বলা
সে যেন গালিবের গজলের রঙে রাঙা।
ওর অধরের মিষ্টি লাজুক হাসি,
সে যেন গোলাপ কুঁড়িতে দিনের প্রথম আলো।
ওর কাছাকাছি আসা
সে যেন গো কোন অচিন পুরের মায়া।

হয়তো ঐ বয়সটার ধর্মই এই। হয়তো ঐ বয়সটায় প্রত্যেকের মধ্যেই

ওরকম একটা অনুভূতি আসে , হয়তো প্রত্যেকেই তখন লুকিয়ে চুরিয়ে একটু আধটু প্রেম- ট্রেম করতে চায় বা করেই থাকে। আমার মধ্যেও তখন বোধ হয় সেই রকমই কিছু একটা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই শুরু হওয়াটা অর্থাৎ যুবা হৃদয়ের প্রণয়- জোয়ারের সেই অবর্ণনীয় উত্তাল আলোড়নটা যত বেশী introversive ছিল ,ততটা extroversive মোটেও ছিল না। আসলে গানের মধ্যে দিয়ে আমার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত হাজার - প্রেমিকের ভালোবাসার অনুভূতির কথা যত সহজে , যত সুন্দর করে আমি বলতে পেরেছি , সুরের মধ্যে দিয়ে যত সহজেই বারবার ছুঁয়ে গেছি আমার হৃদয়ের সেই স্বপ্নস্বরূপিণীকে , বাস্তবে তেমন নিবিড় করে আমার ভালোবাসার কথা কাউকেই সেদিন আমি সেভাবে বলতে পারি নি। হয়তো ভালোবাসার গানের ক্ষেত্রে Cupid আমার দিকে সেদিন যেভাবে মুখতুলে চেয়ে দেখেছিলেন , জীবনের বাস্তব প্রেমের ক্ষেত্রে Eros হয়তো আমার উপর তখন ঠিক ততটাই বিরূপ থেকে গিয়েছিলেন। যেকারণেই হৃদয়ের অন্তস্থলে যে প্রেমকে আমি এত স্বর্গীয় সুষমায় তিল তিল করে গড়ে তুলেছি, শিল্পের আঙ্গিনায় যে প্রেমকে আমি এত নিবিড় করে বারবার কাছে পেয়েছি , বাস্তবের রূঢ় ভূমিতে সেদিন সেই প্রেম সততই আমার থেকে ততই দূরে থেকে গিয়েছিল।

জওয়ান হওয়ার পর লুকিয়ে চুরিয়ে একটু আধটু প্রেম তো প্রত্যেকেই বোধ হয় কম- বেশী করে থাকে বা করতে চায়ই। কিন্তু কারো জীবনে সেটা যেমন সার্থক হয় , আবার কারো কারো জীবনে শুধু frustration এসে যায়। আমার হচ্ছে ঐ দ্বিতীয়টাই। শুধু frustration আর frustration। Success এর মুখই দেখলাম না কোনদিন। স্কটিশে পড়াকালীন হয়তো something started developing , but it never materialised . All my dreams , all my attempts always went in vain . Always. এবং শুধু কলেজে পড়াকালীনই নয় , কলেজ ছেড়ে যখন বম্বে চলচ্চিত্রের রঙ্গিন পরীদের দেশে কাজ করতে গেছি , তখনও Eros এর হাসিমুখ কোনদিনই আমি দেখেনি। উল্টে ভুল পদক্ষেপ দিয়ে প্রায় পিছলে যাবার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল বহুবার। কিন্তু Cupid এর আশীর্বাদেই হোক বা যেভাবেই হোক, ভরাডুবির আগেই শেষ পর্যন্ত সামলেও নিয়েছি নিজেকে। আসলে কলকাতাই হোক আর বম্বেই হোক আমার প্রেমভাগ্যের তাতে কোনদিনই কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি। ১৯২০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত টানা প্রায় তিরিশ বছর দেবদাসের ভূত যেন ছায়ার মতো আমার কাঁধে ভর করেছিল। আমার ঐরকম দেবদাস মার্কা জীবন নিয়ে আমার বন্ধুরাও তখন আমাকে খুব বলাবলি করত , -'আরে তুই কী ! তিরিশ বছরের ওপর বয়স হয়ে গেল তোর , অথচ বিয়ে তো দূর , একটা নিছক প্রেম পর্যন্ত করতে পারলি না এতদিনে ! তোর দ্বারা আর কিস্যু হবে না। আমার মনে আছে আমার বন্ধু গীতিকার ভরত ব্যাস সেই নিয়ে একটা দারুণ গানও লিখে ফেলেছিল সে সময়।

ভরতব্যাস ছিল আমার খুব প্রিয় বন্ধু , খুবই কাছের লোক। আমার উঠতি বয়সের বহু সুখ-দুঃখের সাথী ছিল এই ভরতব্যাস। বম্বেতে কাজ করতে গিয়ে আমি যখন প্রেমের বিফল সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে মরছি , তখন এই ভরত একদিন একটা গান লিখে এনে আমায় বল্লে-"আরে মান্না , লো সুনো , আজ এক আচ্ছাসা গানা লিখকে লায়া হুঁ।" আমি বল্লাম,- ' ক্যা হ্যায় দোস্ত, ক্যায়া এ্যায়সা গানা লিখকে লায়া , মুঝে ভি তো শুনাও জরা।" ও তখন পড়তে লাগলো ,- ' বিন সাথী পার করো জীবন তো জানু .....'। গানটা শুনেই কেন জানিনা আমার তখন খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। বল্লাম ,-"আরে দোস্ত ,তু মুঝে দে দো 'ইয়ে গানা,ম্যায় ইসে গাউঙ্গা '। ও তখন বেশ হাসতে হাসতেই বল্লে ,-' হাঁ, হাঁ , কিউ নেহি ! তুম্হারে লিয়েহি তো ম্যায়নে লিখা হ্যায়। তুম নেহি গাওগে তো কৌন গায়ে গা 'ইয়ে গানা ! ' ওর এই বলার মধ্যে কোথাও যে তখন একটা বিদ্রুপের হাসিও লুকোনো ছিল , প্রথমটায় আমি সেটা ধরতে পারিনি। ভেবেছিলাম যে সত্যি সত্যিই ভরত বুঝি একটা ভালো গান লিখেছে এবং আমার মতো একজন উঠতি শিল্পী বন্ধুকে দিয়ে সেই গান গাওয়ানোর জন্যেই বুঝি আমার কাছে নিয়ে এসেছে। তখন কে আর জানতো যে ঐ গানটা আসলে আমাকে বিদ্রুপ করেই সেদিন ওঁ লিখে এনেছিল। বল্লে, -' তেরে লিয়ে হি তো ম্যায়নে লি্খা হ্যায় 'ইয়ে গানা। তেরে 'ইতনা উম্র হো গয়া, 'ইতনা হট্টাকট্টা আদমি হো তুম , লেকিন অভিতক্ তুম্হারা কোই সাথী নেহি , জিন্দেগী মে কোই চাহনেওয়ালী নেহি , তুম এ্যায়সা গানা নেহি গাওগে তো কৌন গায়েগা 'ইসে ! পুরে 'ইন্ডাস্ট্রিমে তু হি তো এক হ্যায় জো ....!' বন্ধুদের ঐ রকম কথাবার্ত্তা শুনে শুনে মনে মনে আমারও তখন খুব দুঃখ হত। নিজের ওপর নিজেরই তখন খুব একটা ধিক্কার এসে গিয়েছিল। ভাবতাম সত্যিই তো , জীবনের প্রায় অর্ধেকটা বয়স পেরিয়ে গেল, অথচ এই ভর যৌবনেও এখনো একটা প্রেম পর্যন্ত ঠিক মতো করতে পারলাম না , তেমন করে একান্তে কারো সাথে দুটো ভালোবাসার কথা পর্যন্ত বলতে পারলাম না , এ আমার কেমনতর অভিশপ্ত জীবন ! খুব দু:খ হত মনে মনে। আমার এই কান্না ভেজা ভালোবাসার যে দেবদাস সুলভ রোমান্টিকথার কথা বহু চেষ্টা করেও আমি ভাষায় রূপ দিতে পারিনি কোনদিন , শুধু গুমরে মরেছি মনে মনে , সেই আবেগ , সেই অনুভূতিকেই যেন বহুদিন পর একদিন খুঁজে পেয়েছিলাম গীতিকার প্রণব রায়ের লেখা একটি গানে।ওর লেখা -

'.... বুঝি আমার মালায় মায়ার বাঁধন নাই
আপন জনেরে আপন করিয়া বাঁধিতে পারি না তাই
আসে আর যায় কত চৈতালি বেলা
এ জীবনে শুধু মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা
কোন্ সে বিরহী কাঁদে মোর বুকে
তুমি কি শুনিতে পাও

বারে বারে শুধু আঘাত করিয়া যাও....'

গানটা গাইতে গিয়ে আমার সেদিন বুকফেটে কান্না পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, না। শেষ পর্যন্ত এই -ই আমার প্রেমকাহিনীর একমাত্র পরিণতি নয়। ছুটতে ছুটতে হারিয়ে যাওয়া গন্ধ-পাগল কস্তুরী মৃগের মতো এভাবেই শেষপর্যন্ত হারিয়ে যায়নি আমার প্রেম। যেভাবে অগ্রহায়ণের অমাবস্যার রাত ফুরিয়েও ভোরের আলোয় ভেসে যায় চরাচর, যেভাবে মরীচিকার পেছনে ছুটতে ছুটতেও কোনদিন হঠাৎ-ই তৃষাতুর পেয়ে যায় জলের ঠিকানা, সেভাবেই, ঠিক সেভাবেই তার সাথে আমারও শেষ পর্যন্ত একদিন সত্যি সত্যিই দেখা হয়েছিল।

১৯৫০ সাল নাগাদ নীতিন বোস যখন বম্বেতে তাঁর 'মশাল' ছবিটা বানিয়েছিলেন, তখন সে ছবির সংগীত পরিচালক শচীন দেব বর্মনের সহকারী হিসেবে আমারও সেখানে খুবই active involvement ছিল। মিউজিক অ্যারেঞ্জ করা, মিউজিশিয়ানদেরকে নিয়ে রিহার্সাল করা, এসব নিয়েই তখন আমি খুবই ব্যস্ত থাকতাম। শচীনদার সাথে যদিও আমার একেবারে সেই ছেলেবেলার ঘনিষ্ঠতা এবং যদিও বহুদিন ধরেই সফল সহকারী হিসেবে তাঁর আন্ডারে কাজ করছিলাম, কিন্তু তা সত্বেও তাঁর সুরের কোন ছবিতে কোনদিনই আমাকে গান গাইবার সুযোগই দেননি। একজন সহকারী সংগীত পরিচালকের যে সমস্ত কাজ-কম্ম বরাদ্দ থাকে, সেই সমস্ত কাজই আমাকে দিয়ে উনি করাতেন। কিন্তু গান গাওয়াতেন ঐ রফিকে দিয়ে, দুরানীকে দিয়ে, মুকেশকে দিয়ে। কিন্তু আমিও যে মূলতঃ একজন গায়ক, গায়কসত্ত্বটাই যে আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়, সে সমস্ত কিছুর কোন স্বীকৃতিই শচীনদা আমাকে তখনও পর্যন্ত কোনদিন দেননি। এই নিয়ে আমার মনে তখন ভীষণ একটা দুঃখও ছিল। কিন্তু 'মশাল' ছবিটা করার সময় হঠাৎ তাঁর কী মনে হল কে জানে, একদিন আমি যখন রিহার্সাল রুমে মিউজিশিয়ানদেরকে নিয়ে রিহার্সাল করছি, তখন উনি সেখানে এসে আমার হাতে প্রদীপজীর লেখা একটি ভজন ধরিয়ে দিয়ে বল্লেন, - " এই গানডা আমি তর লাইগ্যা বানাইছি। এই গানডা তরই প্লে - ব্যাক করন লাগবো।" শচীন দার সুরে প্লে-ব্যাক করার জন্য মনটা তো সব সময় উদগ্রীব হয়েই ছিল, উনি বলতেই এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম।

আসলে তখন হয়েছিল কি সেইযে "রামরাজ্য" ছবিতে কাকার বিকল্প হিসাবে আমাকে পছন্দ করা হয়েছিল, আমার সংগীত জীবনে সেটা খুবই একটা set- back হয়ে গিয়েছিল। প্রথমতঃ তো বাল্মীকির লিপে গান গেয়ে শুরুয়াত হয়েছিল বলে যত সব বুড়ো, দাড়িওয়ালা ফকির এসব রোলের জন্যই একমাত্র তখন আমাকে ডাকা হত, দ্বিতীয়ত যখনি কাকার মতো ঐ রকম উদাত্ত কণ্ঠের কোন গান গাওয়ার প্রয়োজন হত, তখনই আমার ডাক পড়ত। কিন্তু আমিও যে স্বতন্ত্র্যভাবে একজন গায়ক, আমিও যে অন্যদের মতো রোমান্টিক গান ইত্যাদি গাইতে পারি, সেটা

কোন পরিচালকই বোধহয় তখন ভাবতেই পারতেন না। এমনকি এই যে 'মশাল' ছবিতে প্রথম শচীন দা ডেকে নিলেন, সেটাও practically আমার গায়ক সত্ত্বাকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য মোটেও নয়। ঐ গানের উপযোগী হিসেবে কাকার গায়কীটাকেই আসলে আমার মধ্যে উনি সেদিন পেতে চেয়েছিলেন। সেই বুঝে আমিও অনেকটা প্রায় কাকার নকল করেই গেয়ে দিয়েছিলাম প্রদীপজীর লেখা সেই বিখ্যাত গান, -" উপর গগন বিশাল, নীচে গহরা পাতাল, বীচ্ মে ধরতী বাঃ মেরে মালিক তুনে কিয়া কামাল ....."ঔর সাচ্ মুচ্ হি মালিকনে উসদিন কামাল কর দিয়া থা।'মশাল' ছবিটাতো হিট্ হলোই সেই সঙ্গে আমার গাওয়া এই গানটাও দারুণ হিট হয়ে গেল। বম্বেতে আমারও তখন গায়ক হিসেবে খুব নাম হয়ে গেল। নাম হল মানে ওটাই এককথায় প্রকৃতপক্ষে আমার ক্যারিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট। এই 'উপর গগন বিশাল' গানটা হিট হওয়ার পর থেকেই মূলত অন্যান্য সংগীত পরিচালকেরাও তাদের ছবিতে একটু আধটু করে আমাকে গান গাইতে সুযোগ দিতে শুরু করেছিলেন। এবং নামযশ তথা অর্থোপার্জন দুই -ই তখন আমার যুগপৎ বেশ ভালই হচ্ছিল।

আমার বাড়ীর লোকেরা যখন দেখলেন যে ছেলে গান বাজনায় বেশ নাম করেছে, রোজগার পাতিও বেশ ভালোই করছে, তখন তাঁরা ভাবলেন যে এবার তাহলে ছেলের বিয়ে একটা দেয়া দরকার। বাড়ীর বাইরে এতদূরে একা একা থাকে, কি খায়, কি না খায়, এখন ওর একটা বৌ অবশ্যই দরকার। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। হঠাৎ বাবার একটা তার পেলাম -" যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি একবার বাড়ীতে এসো"। আমাদের তো সেই জয়েন্ট ফ্যামিলি। বাড়ীতে আসতেই আমার বাবা - কাকারা সবাই বল্লেন যে একটা মেয়ে দেখা হয়েছে খুবই সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, তুমি একবার দেখো, তারপর কথা বলে যাও। এবং এর পরদিনই আমাকে দেখানোর জন্য সেই মেয়েটিকে একেবারে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসা হল। দেখলাম বেশ সুন্দরী মেয়ে। ফর্সা, ছিপছিপে, লম্বাটে ধরনের গড়ন। এক নজরেই ভালোলাগার মতো টানা চেহারা। তায় আবার গ্র্যাজুয়েট। এককথায় আকর্ষণীয়া এবং গুণবতী। বল্লাম, - খারাপ কি, রূপে -গুণে তো মেয়েটি বেশ ভালই। শুনে বাবা- কাকারা বল্লেন, - very good. তাহলে এখানেই তোমার বিয়ের কথা পাকা করে ফেলি। আমি বল্লাম, - -'সে কি ! বিয়ে তো আমি এখানে করতে পারবো না। তোমরা দেখতে বলেছো, দেখেছি। That much ! কিন্তু বিয়ে তো আমি এখানে করব না।" আমার কথা শুনে অভিভাবকদেরতো প্রায় যেন একেবারে মাথায় হাত দেয়ার অবস্থা। কারণ যদিও তারা মেয়েটিকে আমার দেখার একটা provision রেখেছিলেন, কিন্তু সেটা ছিল খুবই একটা casual ব্যাপার। আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগের সামাজিক কাঠামো অনুযায়ী প্র্যাকটিক্যালি ওঁরা বোধহয় ঐ জায়গায় কথা

প্রায় দিয়েই ফেলেছিলেন । তাই আমি এ বিয়েতে অসম্মত হওয়ায় ওঁরা সবাই মিলে আমাকে প্রায় যেন চেপে ধরলেন,- মেয়ে যখন তোর পছন্দ হয়েছে , তাহলে কেন করবি না বিয়ে , কী অসুবিধে আছে , সম্ভ্রান্ত পরিবার ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কেন যে করব না আমিও মুখ ফুটে খোলাখুলি ওদেরকে সেকথা কিছুতেই তখন বলতে পারছিলাম না। করবো না , করা সম্ভব নয় , অসুবিধে আছে এসবই শুধু বলতে পারছি। আর কিছুই খুলে বলতে পারছিনা । খুবই একটা বাজে টানা পোড়েনের অবস্থা গেছে সেটা ।তখন একদিন দুপুর বেলা সবার খাওয়া দাওয়া হয়ে যাওযার পর মা আমার ঘরে এসে আমাকে জিজ্ঞেস খরলেন ,-" কি রে ,তোর অসুবিধেটা কি ? কেন তুই এই মেয়েকে বিয়ে করতে পারবি না ,বাবা-কাকাকে না বলতে পারিস , আমাকে তুই খুলে বল তোর অসুবিধেটা আসলে কি।" তখন মাকেই আমি সব খুলে বল্লাম। মা শুনে বল্লেন - " সে কী !" আমি বল্লাম ,- হ্যাঁ , বিয়ে যদি করি তো তাকেই করবো ,আর তোমরা যদি মত না দাও তাহলে বিয়েই করবো না। শুধু "ভালোবেসে যাবো।" দেখলাম মাকে চিরকাল আমি যা ভেবে এসেছি exactly she was much more than that . When every one of our family was dead against my love- marriage , তখন একমাত্র আমার মা-ই সেদিন আমার হয়ে সারা বাড়ীর বিরুদ্ধে counter logic দিয়েছিলেন। বল্লেন,- " দ্যাখ , বিয়ে তো তোর বাবা-কাকা করবে না, বিয়ে করবি তুই। ওকে নিয়ে সারাজীবন ঘর করবি তুই ,তোর বাবা-কাকা নয়। তাই তুই যদি মনে করিস যে এই বিয়েতে তোরা দুজন সুখী হবি , তাহলে তুই যা , ওকেই গিয়ে বিয়ে কর। আমার আশীর্বাদ রইল , তোরা সুখী হবি।"

আসলে হয়েছিল কি সেই যে বম্বের 'ইন্ডিয়া কালচার লীগ' ক্লাবে একটি মালয়ালি মেয়ের সাথে দ্বৈত রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান করেছিলাম, সেই মেয়েটিকে প্রথমদিন দেখেই কেন জানিনা বহুদিনের গুমরে ওঠা একটা চেনা সুর সেদিন হঠাৎই যেন আমার হৃদয়-বীণার তারে তারে বেজে উঠেছিল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম এতদিন যাকে পাগলের মতো গালিবের গজলের রঙ বাহারে আমি খুঁজে গেছি , খুঁজেছি হালকা হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো পেঁজা-মেঘের ফাঁকে ফাঁকে শরতের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার লুকোচুরি খেলায় ,খুঁজেছি শিরা - উপশিরায় আগুন ধরিয়ে দেয়া যৌবনের তপ্ত-উত্তাপ শোনিত প্রবাহে , রক্ত -মাংসে গড়া সেই স্বপ্নস্বরূপিণীকেই যেন সেদিন হঠাৎই আমি খুঁজে পেয়েছিলাম রবীন্দ্রানুষ্ঠানের আঙ্গিনায়।' লহ লহ তুলে লহ নীরব বীণাখানি .....' গাইতে গাইতে কবে কখন যে সত্যি সত্যিই তুলে নিয়েছিলাম দুজন দুজনার হৃদয় বীণাখানিও , কবে যে হৃদয়ে সুর উঠেছিল বসন্ত- বাহারে বুঝতেও পারিনি। আর যখন বুঝলাম, তখন ছায়া ঘেরা ব্রজের পথে পথে এসে গেছি বহুদূর ।

সুলোচনাদের আদি বাড়ী ছিল উত্তর মালাবারের কাছে কেরালার ক্যান্নানোর অঞ্চলে। ওর জন্মও ঐ ক্যান্নানোরেই। তবে একেবারে সেই চার বছর বয়স থেকে বম্বেতে থেকে থেকে practically ওঁ যতটা না মালয়ালি তার চেয়ে বেশী বোধহয় বম্বেওয়ালি। লেখা -পড়া থেকে শুরু করে ওঁর জীবনের সমস্ত কিছুই ঐ বম্বেতে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ও ফরাসি ভাষার কৃতী ছাত্রী ছিল ওঁ। দারুণ talented ,দারুণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা। জীবনের কোন পরীক্ষায় সে প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হয় নি কোনদিন। ইংরেজী ও ফরাসী ভাষার অধ্যাপনাও করেছে সে বহুদিন। গানও গাইতে পারতো খুবই চমৎকার। খুবই মিষ্টি গানের গলা ছিল এবং পড়াশোনার পাশাপাশি বাড়ীতে প্রশিক্ষক রেখে কর্ণাটকী ক্ল্যাসিকাল মিউজিকও শিখেছিল বহুদিন। রবীন্দ্রসংগীতও গাইতে পারতো খুব ভালো। আর শুধু কি তাই সেলাই-ফোঁড় থেকে শুরু করে যখন যেটাতেই সে হাত দিয়েছে excel করে গেছে। আমার মনে আছে একবার মেয়েদের জন্মদিন উপলক্ষে বম্বের বিখ্যাত dress house 'ক্যাথরিন ' এ আমি গিয়েছিলাম মেয়েদের একটা dress কেনার জন্য। দোকানের যিনি মালিক ছিলেন , একজন French lady, উনি আমাকে বল্লেন - দাদা আপনার মিসেস যত ভালো ড্রেস বানাতে পারে , তেমন কারিগরই আমাদের এখানে নেই। খুবই দুঃখিত যে তেমন ভালো ড্রেস আপনাকে আমি দিতে পারলাম না। এত ভালো ড্রেস মেকার সে। আমি তো বলব যে ওর মতো ওরকম ভালো স্টিচিং করতে , ওরকম ভালো বুনতে আমি কাউকেই কোনদিন দেখিনি। যদি ওর বোনায় কোথাও কেউ কোনদিন একটা ভুল ধরিয়ে দিতে পারে , ওঁ পুরোটাই সাথে সাথে reject করে দেবে। আসলে সেলাই-ই হোক আর পড়াশোনা বা গানবাজনাই হোক perfect না হওয়া পর্যন্ত ওঁ যেন কিছুতেই স্বস্তি পেত না। আমার মনে আছে বহুদিন আগে একবার আমার জন্য ওঁ একটা Fairisle বুনে ছিল। ফেয়ার আইল তো সাধারণত সুইজারল্যান্ডের লোকেরাই বেশী পরে। ওঁর হঠাৎ মনে হল সেই একটা আমাকেও ওঁ পরাবে। যেদিন ওটা বোনা complete হল , সেদিন আমার শ্যালিকা মানে ওর ছোটবোন এসে ওটা দেখে বল্লে ,- এচি (দিদি) এখানটায় বোধহয় তোর সামান্য ভুল হয়েছে। বল্লে বিশ্বাস হবে না একমাস ধরে এত মেহনত করে , এতগুলো রঙের কম্বিনেশন করে করে বোনা এত সুন্দর একটা ফেয়ার আইল বোনের ঐ এক কথায়ই একটানে সব খুলে ফেল্লে ! আবার শুরু হ'ল নতুন করে বোনা।

একে সুন্দরী তায় আবার ওরকম গুণবতী , আমি তো এককথায় তার প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম তখন। কিন্তু ওদিকে ক্যারিয়ারের দিক থেকে বম্বেতে আমার তখন খুবই খারাপ অবস্থা চলছিল। খারাপ অবস্থা মানে , কোথাও আমি সেভাবে ফুটিংই পাচ্ছিলাম না সে সময়। রোজগার পাতি হয়তো কিছু কিছু হচ্ছিল ঠিকই , কিন্তু সেটাকে ক্যারিয়ার বলা যায়না কোনভাবেই। এককথায় বম্বেতে আমি যখন প্রায় অস্তিত্ব সঙ্কটের

মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি , যখন বম্বে ছেড়ে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় ফিরে আসার প্রশ্নও প্রায় দেখা দিয়েছে , ঠিক সেইরকম একটা দুঃসময়েই আমার জীবনে এলো সুলোচনা। বোধহয় সেটা ১৯৪৯ কি '৫০ সালের কথা। আমার ভেতরে potential তো ছিল ঠিকই ,কিন্তু সেটাকে যথার্থভাবে যেন প্রকাশ করতে পারছিলাম না কিছুতেই। কেমন যেন একটা উদ্দেশ্যহীনভাবে পথ চলা , সব কিছুতেই কেমন যেন একটা অস্থিরতা , একটা restless মনোভাব। কিন্তু ওঁ আসার পর আমার জীবনের সেই এলোমেলো ধারাটাই কেমন যেন এক্কেবারে বদলে গেল। বহুবার শোনা , বহুবার গাওয়া এতদিনকার সমস্ত গানের যেন নতুন একটা অর্থ খুঁজে পেলাম। গানগুলো যেন একেবারে অন্যরূপে , অন্যরঙে আমার মধ্যে এসে ধরা দিতে লাগলো। ক্লাবে , পার্কে, এখানে ওখানে লুকিয়ে চুরিয়ে তো আমাদের তখন প্রায় প্রতিদিনই দেখা-সাক্ষাতের ঝড় চলছিল। কিন্তু যখনই দেখা হত বা যেখানেই দেখা হত সেখানে আমাদের প্রেম নিবেদন যতটা না ছিল সংলাপধর্মী ,তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল বোধহয় গীতিময়। আমার গলায় রবীন্দ্রনাথের গান , কাকার গান , শচীনদার গান , সুরসাগর হিমাংশু দত্তের গান এসবগুলো ওঁ তখন খুব শুনতে চাইত। বিশেষ করে খুব শুনতে চাইত ঐ - " ফিরে এলো শ্রাবণ ধারে ' এবং ' ওগো সারাটি যামিনী জাগি গোপন কথাটি কহ ' গান দুটো , কিন্তু আমি তখন এত অস্থিরমতি , এত restless ছিলাম যে কোন গানই ওকে ঠিকমতো পুরোটা শোনানোর মতো ধৈর্যটুকুও রাখতে পারতাম না। যে গানই ওঁ শুনতে চাক না কেন , দু-তিন লাইন গেয়েই আমি বন্ধ করে দিতাম। প্রথম প্রথম এসব দেখে - শুনে আমার ওপর ওঁ খুবই বিরক্ত হত। এত বিরক্ত হত যে মাঝে মাঝে বলেই ফেলত - Why do you stop like this ? Why are you so restless ! বলত - you are having such a brilliant voice , your singing is so rich , so different than anybody else , yet why do you fail to achieve your goal ! তখনই মেয়েদের যা সহজাত ধর্ম আর কি , ব্যাপারটা নিয়ে ওঁ তখন ভাবতে লাগলো যে ভদ্রলোকের এত ভালো গলা , এত ভালো গায়. কিন্তু এ এত অস্থির কেন ! একে বাঁধতে হবে , মনের মধ্যে স্থিতি আনতে হবে। That is the first step she took . May be আমার জন্য so called প্রেম -ভালোবাসা তার মধ্যে তখনও হয়তো সেভাবে develop ই করে নি , just এই ভদ্রলোককে একটু help করি, - এরকম একটা attitude নিয়েই হয়তো ওঁ সেদিন আমার জীবনে এগিয়ে এসেছিল। হয়তো আমার অস্থির মনটাকে একদিন সে সত্যি সত্যিই শেষপর্যন্ত arrestও করেছিল , কিন্তু ' দীপ জ্বেলে যাই ' এর সেই lady ডাক্তারের মতোই খেয়ালই করে নি যে treatment করতে করতে মানে arrest করতে করতে নিজের অজান্তেই সে নিজেই কবে কখন আমার হৃদয়ে arrest হয়ে গেছে। আমার জীবনে ওর inspiration , ওর অবদান যে কী অর্থবহ , কী ব্যঞ্জনাময় সেটা ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য আমার

নেই। Really স্ত্রী যে কী , জীবনে স্ত্রীর ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সুলোচনাকে স্ত্রী হিসাবে না পেলে হয়তো সেই অর্থটা আমার কোনদিনই সেভাবে বোঝাই হত না , সুলোচনা না এলে আমার জীবন যে শেষ পর্যন্ত কোন খাতে বইত , বলা মুস্কিল। ওর inspiration ই জীবনের অনেক কালবৈশাখী পার করে আজ আমায় এই খানে নিয়ে এসেছে। আমার মনে আছে আমাকে যখন 'বসন্ত বাহার ' ছবিতে পন্ডিত ভীমসেন যোশীর সাথে ডুয়েট গাওয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল , আমি তো এক কথায় সেই offer টা নাকচ করে দিয়েছিলাম। পাগল নাকি! ভীমসেন যোশীর মতো ঐরকম গাইয়ের সাথে কেউ কোনদিন ডুয়েট গায় নাকি ! এক তান লাগালেই কোথায় উড়িয়ে ফেলে দেবে আমাকে , ওর সাথে কেউ ডুয়েট গায় নাকি ! charity show তে গামার সাথে কুস্তি লড়াটাও না হয় একবার কষ্টকরে ভাবতে পারি, কিন্তু ভীমসেন যোশীর সাথে ডুয়েট গাওয়া, না না ও আমার দ্বারা হবে না। কিন্তু আমার স্ত্রী আমার ওসব কোন কথায় কোন পাত্তাই দিল না। বল্ল,- " আমি তোমার কোন কথাই শুনতে চাই না , তোমাকে এই গান গাইতেই হবে। তুমি কেন বুঝতে পারছো না, your advantage is that you are singing for the hero , so come on , you are going to win ." আমি বল্লাম যে দেখো , আমারও লজ্জাটাতো সেখানেই,- I am to sing for the hero and as the situation demands , I am to win against Bhimsen Joshi ! তাই কি কখনো হয়, লোকে কি বলবে !! স্ত্রী বল্লে - Why you are not exploiting your advantage , why you are not taking this opportunity as a challenge ! তুমি এমন কিছু একটা কর যেটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে , যেটা শুনে লোকে বলবে - বাঃ hero সত্যি সত্যিই hero র মতোই গেয়েছে। -এই করেই সৃষ্টি হয়েছিল ' বসন্ত বাহার ' এর সেই বিখ্যাত গান - ' কেতকী গুলাব জুঁহি চম্পক বনফুলে ..... ।" বোধহয় ভীমসেন যোশীজীর এটাই ছিল জীবনের প্রথম প্লে-ব্যাক।

এরপর তো শুধুই জীবনের সেইসব মিষ্টি- মধুর গানের অবিরাম একটানা সুর -' ইয়ে রাত ভিগি ভিগি ', 'হায় হায় গো রাত যায় গো '....। এভাবেই একদিন ' আমার না যদি থাকে সুর তোমার আছে তুমি তা দেবে , তোমার গন্ধহারা ফুল আমার কাছে সুরভি নেবে ' স্বপ্নে বিভোর হয়ে যে জীবনের পথে আমরা পা বাড়িয়েছিলাম, কালের গতিতে সেই অনুভূতিই একদিন এসে যেন " তুমি আর আমি আর আমাদের সন্তান এই আমাদের পৃথিবী , তুমি সুর আমি কথা মিলে মিশে হই গান , এই আমাদের পৃথিবী " গানে পরিনতি পেল। দুজনার ছোট্ট সংসার আলো করে এলো সুলোচনার 'সু' আর মান্নার 'মা' মিলেমিশে সুরমা এবং সুমিতা। ' লোরি ' গাওয়ার রেশ কাটতে না কাটতেই কালের অমোঘ নিয়মে রোমান্টিকতা মথিত হতে হতেই এসে যায় কর্তব্যেরও নতুন স্বপ্ন - ' মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় , মনে হয় জীবনের কত কাজ .....।"

এভাবেই একটি একটি করে এগিয়ে যায় আরো বহুদিন। বদলে যায় আকাশের রঙ। " ও কেন এত সুন্দরী হ' ল " বা " রঙ্গিনী কত মন দিতে চায় " র মতো রোমান্টিক গানে আত্মবিভোর গায়ককেও চশমার পুরু কাঁচের আড়ালে ভেজা চোখে একদিন গাইতেই হয় - ' তুই কি আমার পুতুল পুতুল সেই ছোট্ট মেয়ে ..... '। তারপর সত্যি সত্যিই একদিন ওদের ডোলি ওঠে , ওরা চলে যায় জীবনের নতুন অধ্যায়ে। ওদের চলে যাওয়া পথের শেষ কৃষ্ণচূড়াটার দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে ভাবি চল্লিশের দশকের উচ্ছল প্রেমিকের বাঁধভাঙ্গা রোমান্টিক প্রেম আশির দশকে এসে কি সুন্দর বদলে যায় পিতা-পুত্রীর স্বর্গীয় প্রেমে ! হয় তো এরই নাম জীবন। হয়তো এই জীবনেরই অন্য নাম - প্রেম।